আরণ্যক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

প্রস্তাবনা

সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া ছিলাম।

নিকটেই একটা বাদামগাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদামগাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউ খেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্নের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।

অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা শহরের হইচই কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূ-ধূ ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণি, গভীর রাত্রে বন্য নীলগাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোনো অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।

কুন্তা... মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনও যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসারযাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নয়তো জ্যোৎস্নাভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণে, ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা... নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া!...

দক্ষিণ দেশে ধরমপুর পরগণার ফসল মারা যাওয়াতে ধাতুরিয়া নাচিয়া-গাহিয়া পেটের ভাত জুটাইতে আসিয়াছিল, লবটুলিয়া অঞ্চলের জনবিরল বন্য গ্রামগুলিতে... চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় খাইতে পাইয়া কি খুশির হাসি দেখিয়াছিলাম তার মুখে! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, একটু মেয়েলি ধরনের ভাবভঙ্গি, বছর তেরো-চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী ছেলেটি; সংসারে বাপ নাই, মা নাই, কেহ কোথাও নাই, তাই সেই অল্প বয়সেই তাহাকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই দেখিতে হয়... সংসারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল আবার। মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। আমার খড়ের বাংলোর কোণটাতে বসিয়া সে বড়ো বড়ো সুপারি জাঁতি দিয়া কাটিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোটো কুঁড়েঘরের ধারে বসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে তিনটি মহিষ চরাইতেছে এবং আপন মনে গাহিতেছে—

দয়া হোই জি

মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারির বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বসিয়া বন্য শিকারির মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম,

কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনির অবতারণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

পনেরো-ষোলো বছর আগেকার কথা। বি.এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেক দিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোনো কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় একটুকরা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষে ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকি, আমি যেন চাকরের হাতে অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোনো জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম। পাড়ার নানান স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে, অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো বড়োরাস্তার ওপারে কলেজ হোস্টেলের ফটকে নহবৎ বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোক ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরির খোঁজে হেন মার্চেন্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন

খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড়োলোকের বাড়ি নাই যেখানে অন্তত দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, কিন্তু সকলেরই এক কথা, চাকুরি খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্তমানে সে আলীপুরের উকিল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসার-সমুদ্রে বর্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা তো দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যতদূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি সতীশকে দেখিয়া সে-কথা আপাতত ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল, "এই যে, কোথায় চলেছ সত্যচরণ? চলো হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখে আসি আমাদের পুরোনো জায়গাটা। আর ও-বেলা বড়ো জলসা হবে এসো। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড়ো গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম মাঝে মাঝে করি কি না। এসো, তোমায় দেখলে সে খুশি হবে।"

কলেজে পড়িবার সময়, আজ পাঁচ-ছয় বছর আগে, আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোস্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে, তাহারা কিছুতেই আসিতে দিতে চাহিল না। বলিলাম, "বিকেলে জলসা হবে, তা এখন কি! মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।"

তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজার দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জলসার আসরে গিয়া বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্বের ছাত্র-জীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল কে মনে রাখে যে চাকুরি পাইলাম কি না-পাইলাম, মেসের ম্যানেজার মুখ

হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে। ঠুংরি ও কীর্তনের সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতে বায়ু-ভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জলসা যখন ভাঙিল তখন রাত এগারোটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোস্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম একবার স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। অবিনাশ প্রস্তাবকর্তা আমি প্রতিবাদী পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষে তুমুল তর্কের পর সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায় যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল, "চলো, আমার গাড়ি রয়েছে তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাকো?"

মেসের দরজায় নামাইয়া দিয়া বলিল, "শোনো, কাল হ্যারিংটন স্ট্রিটে আমার বাড়িতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখো তো নোটবইয়ে।"

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন স্ট্রিট বাহির করিলাম, বন্ধুর বাড়িও বাহির করিলাম। বাড়ি খুব বড়ো নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইস্টারিয়া লতা, নেপালি দারোয়ান, ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকির বাঁকা রাস্তা রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসের বন, অন্য ধারে বড়ো বড়ো মুচকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়িবারান্দায় বড়ো একখানা মোটর গাড়ি। বড়োলোকের বাড়ি নয় বলিয়া ভুল করিবার কোনো দিক হইতে কোনো উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন দিনের কথাবার্তায় আমরা দু'জনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের একজন বড়ো জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়িতে তাঁহারা কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন এখনও কেহই আসেন নাই।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশ বলিল, "এখন কী করছ সত্য?"

বলিলাম, "জোড়াসাঁকো স্কুলে মাস্টারি করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি

একরকম। ভাবছি, আর মাস্টারি করব না। দেখছি অন্য কোনো দিকে যদি দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।"

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড়োলোকের ছেলে, মস্তবড়ো এস্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরির উমেদারি করিতেছি এটা না-দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, "তোমার মতো একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরি পেতে দেরি হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে, তুমি তো আইনও পড়েছিলে না?"

বলিলাম, "পাশও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।"

অবিনাশ বলিল, "আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?"

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরির প্রস্তাব আপনা হইতেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মতো বলিলাম, "ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো?"

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল, "ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারির ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মতো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কী যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজি হয়ে যাও আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।"

"বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভালো, এমন নয় গোষ্ঠবাবু "

"সে আর আমার জানতে বাকি নেই, ম্যানেজার বাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড়ো কষ্ট হতো, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশি তিন দিন থাকতে পারি নে।"

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম, "বলে কি!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় না কি?"

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, "ঠিক তাই, ম্যানেজার বাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।"

"কী দেখব?"

"জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোনো গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভালো লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মকদ্দমার কাজে কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।"

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, "বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভালো নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।"

কৌতূহলের সহিত বললাম, "বলেন কি! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?"

"বেশি না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড়ো খারাপ। তা ছাড়া, এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে নিলে দেখবেই বা কে?"

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানি চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এ-সব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনোই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড়ো মুগ্ধ করিল।

৪

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোটো পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদিঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রিটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরির খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এইসব মূর্খ, বর্বর মানুষ এরা একটা ভালো কথা বলিলে বুঝিতে পারে না এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তখন সংকল্প করিলাম, এ-মাসের আর সামান্য দিনই বাকি, সামনের মাসটা কোনোরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তারপর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য

বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

পূর্বে কী জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালোবাসি! মানুষকে এত ভালোবাসি! তাহাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য হয়তো সব সময় তাহা করিয়া উঠিতে পারি না কিন্তু ভালোবাসি তাহাদের নিশ্চয়ই। নতুবা এত কষ্ট পাইব কেন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়া?

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংয়ে বই বিক্রি করে সেই যে বৃদ্ধ মুসলমানটি, কতদিন তাহার দোকানে দাঁড়াইয়া পুরোনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাইয়াছি কেনা উচিত ছিল হয়তো, কিন্তু কেনা হয় নাই সে-ও যেন পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল তাহাকে আজ কতদিন দেখি নাই!

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহি মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "কী মুনেশ্বর?"

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দি কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল, "হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরি বাবুকে।"

"কী হবে লোহার কড়া?"

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত সুরে বলিল, "একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা কিন্তু হুজুর, বড়ো গরিব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।"

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত